যথার্থভাবে ব্যবহার করে গিল্ড শক্তির কেন্দ্র এবং সংস্কৃতি ও প্রগতির একটি আধার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। গুপ্ত যুগে গিল্ড ছিল যুগপৎ সমাজের শক্তি ও অলঙ্কার।

নগরায়ণ (Growth of Cities) : প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ভিত্তিতে রামশরণ শর্মা খ্রিস্ট পূর্ব ৫০০ থেকে খ্রিস্টিয় ১০০০ পর্যন্ত নগরায়ণের কাহিনি রচনা করেছেন। তাঁর মতে, ভারতবর্ষে নগরের উদ্ভব হয় খ্রিঃ পূঃ আনুমানিক ২৩৫০-এ, হরপ্পাকালীন ব্রোঞ্জ যুগে। হরপ্পীয় নগর খ্রিস্ট পূর্ব ৬০০ বছর অর্থাৎ খ্রিস্ট পূর্ব ১৭৫০ অব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এরপর গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগর জীবনের সূচনা হয় খ্রিস্ট পূর্ব ৫০০ অব্দে এবং খ্রিঃ পূঃ ২০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টিয় ৩০০ পর্যন্ত নগরজীবন চরম উৎকর্ষতা অর্জন করে। অধিকাংশ নগর ৩০০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ অবলুপ্ত হয়ে যেতে থাকলেও কিছু নগরের অস্তিত্ব ৬০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত থাকে। তারপর সেগুলিও ধ্বংস হয়ে যায়। এমন নগর এদেশে খুব কমই আছে, উৎখনন থেকে যার অস্তিত্ব ১০০০ খ্রিস্টাব্দে ছিল বলে মনে হয়। ড. শর্মা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলিকে ভিত্তি করে দেখাতে চেয়েছেন যে, গুপ্ত যুগে শিল্প-বাণিজ্যে অবনতি নগর-বসতিগুলির ক্রম অবনতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। গুপ্ত যুগে খ্রিস্টিয় চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর পর অনেক নগর বসতি পরিত্যক্ত হতে দেখা যায়। মধ্য যুগের আগে সেখানে বসতির আর কোন লক্ষণ দেখা যায় নি। লুধিয়ানার অন্তর্গত সঙ্ঘোল, পুরাণকিল্লা (ইন্দ্রগুপ্ত), হস্তিনাপুর, মথুরা, কৌশাম্বী, রাজঘাট (বারাণসী), রাজগীর, বৈশালী, চিরান্দ প্রভৃতি প্রত্নক্ষেত্রে আবিষ্কৃত স্তর বিন্যাসে মনুষ্যবসতির ধ্বংসাবশেষ থেকে এই চিত্র স্পষ্ট হয়। একই অবস্থা মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক এবং অন্ধ্রে লক্ষ্য করা যায়। ভূমিদানের প্রচলন হওয়ায় শিল্প ও বাণিজ্য গুরুত্ব হারায়, মুদ্রার ব্যবহার হ্রাস পায়। এই ঘটনাগুলির প্রতিকূল প্রভাব নগরজীবনের ওপর পড়ে। অগ্রহার ব্যবস্থার উদ্ভব ও বিকাশের ফলে যে স্বনির্ভর আবদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির জন্ম হয়, সেখানে লেনদেন হবার মত পণ্য যথেষ্ট উৎপাদন হত না। গ্রামের উৎপাদন গ্রামেই ভোগ করা হত। এই অবস্থা বাণিজ্যের পক্ষে প্রতিকূল হয়ে পড়ে। বাণিজ্যিক অবক্ষয়ের সবচেয়ে প্রধান প্রমাণ হিসাবে শর্মা মুদ্রা ব্যবহারে ব্যাপক হ্রাসের ঘটনাকে উপস্থাপিত করেন। মুদ্রাশ্রয়ী অর্থনীতি শর্মার ব্যাখ্যা অনুযায়ী রক্তাল্পতার (মানিটারী অ্যানিমিয়া) শিকার হয়। ভোগ্য পণ্যের উৎপাদন ও লেনদেনে ভাঁটা পড়েছিল। ড. শর্মার বিচারে, গুপ্তোত্তর যুগের শহরগুলি মূলত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, অথবা তা স্থায়ী ও অস্থায়ী সামাজিক ছাউনিমাত্র (যা সমকালীন তাম্রশাসনে 'জয়স্কন্ধাবার' বলে অভিহিত)। তীর্থক্ষেত্রগুলিও নগরের আখ্যা পেতে থাকে। কিন্তু কারিগরী উৎপাদন ও পণ্য বিনিময়ের এলাকা হিসাবে

নগরায়ণের ক্রম-অবনতিতে ড. রামশরণ শর্মার অভিমত

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

নগরের যে বিশিষ্ট ভূমিকা তার সুযোগ গুপ্তোত্তর যুগে অত্যন্ত অল্প ছিল। অর্থাৎ সম্পদের উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থায় নগরের সক্রিয় আর্থিক ভূমিকা এই আমলে ক্রমক্ষীয়মান। অধ্যাপক শর্মার ধারণা অনুযায়ী মুদ্রা ব্যবস্থার মতই নগরজীবনেও রক্তশূন্যতা (আর্বান অ্যানিমিয়া) দেখা দিয়েছিল। আদি মধ্যযুগে বাজার অর্থনীতির অবসানে ক্রমশ আঞ্চলিক প্রয়োজন আঞ্চলিক উৎপাদনের দ্বারা মেটানোতে 'যজমানী প্রথা' বৃদ্ধি পায়। কারিগর ও শিল্পীরা শহরে-নগরে তাদের দ্বারা উৎপন্ন পণ্যদ্রব্যের বাজার না পাওয়ায় দূরবর্তী গ্রামে গ্রামে সেই পণ্য কৃষকদের প্রয়োজনে যোগান দিতে থাকে এবং কৃষকরাও বৎসরান্তে ফসল উঠলে শস্য দিয়ে কারিগর-শিল্পীদের পাওনা মিটিয়ে দিত।

কিন্তু শর্মার অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলি সর্বগ্রাহ্য নয়। ড. ভাস্কর চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, "অধ্যাপক শর্মার তত্ত্ব অবশ্য সর্বভারতীয় অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাখ্যা দেয় না। যেমন, কনৌজ নগরীর অস্তিত্ব ছিল খ্রিস্টিয় ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত, নালন্দা, বিক্রমশীলা, বলিরাজগড় (মধুবনি), বানগড় (দিনাজপুর), চন্দ্রকেতুগড় প্রভৃতি স্থানে গুপ্তোত্তর যুগ, এমন কি পালযুগ পর্যন্ত সমৃদ্ধশালী নগরীর অস্তিত্বের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া গেছে।"[১] অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত সময়সীমায় উত্তর ভারতের বেশ কয়েকটি বিখ্যাত নগর যে অবক্ষয়ের কবলে পড়েছিল, তার প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অস্বীকার করেন না। কিন্তু অবক্ষয় সার্বিক ছিল না বলেই তিনি মনে করেন। অধ্যাপক শর্মা যেমন প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের ওপর ভিত্তি করে চতুর্থ ও পঞ্চম শতকে উত্তর ভারতের অনেকগুলি নগরের জরাজীর্ন অবস্থার চিত্র তুলে ধরেছেন, অধ্যাপক ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় এই অনুরূপ পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্য দিয়েই বেশ কিছু নগরের অস্তিত্ব একই সময়ে দেখিয়েছেন। এই নগরগুলি হল, যথাক্রমে—বেরিলি জেলার অহিচ্ছত্র, উত্তরপ্রদেশের অত্রঞ্জিখেড়া, বারাণসীর নিকটস্থ রাজঘাট, বিহারের চিরন্দ, হরিয়ানার পেহোয়া, গোপাদ্রি (বর্তমানের গোয়ালিয়র), সায়াডোনি, বর্তমান বুলন্দ শহরের নিকটস্থ তত্তানন্দপুর প্রভৃতি। খ্রিস্টিয় পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের দুই তামিল মহাকাব্য—শিলপ্পাদিকারম্ ও মণিমেখালাই থেকে দক্ষিণ ভারতে কাবেরীপত্তনম্ নগরের সমৃদ্ধির কথা জানা যায়।

ড. রামশরণ শর্মার মতের সমালোচনা

তাই নগরের অবক্ষয়ের ধারণা অনেক গবেষক মেনে নিতে পারেন নি। ড. রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন—"শর্মার সঙ্গে এই অবধি সহমত হওয়া চলে যে, খ্রিঃ ১০০০-এর পর থেকে নগরায়ণ দ্রুততর হয়। কিন্তু উত্তর ভারতে ও মধ্য ভারতে ১০০০ খ্রিঃ-এর বেশ আগেই পূর্ণাঙ্গ নগরের বিকাশ সন্দেহতাতীভাবে প্রমাণ করা যায়। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের নগরগুলিকে তৃতীয় দফার নগরায়ণের অন্তর্গত বলে মনে করেন।"[২]

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সমুদ্রপথে যাতায়াতের [illegible] বা ঝড়-ঝঞ্ঝায় বাণিজ্যপোত জলমগ্ন হত, দিক-নির্ণয়ও কঠিন ছিল। কিন্তু সামুদ্রিক বাণিজ্যে লাভের অঙ্ক অনেক বেশি থাকায় বণিকরা সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার ঝুঁকি নিতেন।

শুল্ক : শিল্প-বাণিজ্যের সমৃদ্ধি রাজকোষে অর্থাগমের পথ প্রশস্ত করে। পণ্যসামগ্রীর উপর যে শুল্ক ধার্য হয় তা থেকে রাজকোষে অর্থ জমা পড়ে। কোষকার অমর শুল্কের কথা বলেছেন। স্কন্দগুপ্তের বিহার প্রস্তরলেখে 'শৌল্কিক' নামে শুল্কসংগ্রহকারী এক রাজপুরুষের উল্লেখ আছে। সম্ভবত প্রতি শহর ও বন্দরে শুল্ক বিভাগের শাখা ছিল। শুল্কের হার কী ছিল তা জানা যায় না।

পেশাদারি সংগঠন : গুপ্তযুগের কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্যের আলোচনা প্রসঙ্গে শিল্পী ও বণিকদের পেশাদারি সংগঠনগুলি সম্পর্কে দু'চারটি কথা বলার প্রয়োজন আছে। সমকালীন সূত্রে এই সংগঠনগুলিকে কখনও 'শ্রেণী', কখনও 'নিগম', আবার কখনওবা 'সংঘ' বলা হয়েছে। প্রথম কুমার-গুপ্ত ও বন্ধুবর্মার মন্দসোর লেখে এক পট্টবায়শ্রেণী বা রেশমশিল্পী সংঘের উল্লেখ আছে। স্কন্দ-গুপ্তের ইন্দোর তাম্রশাসনে ইন্দ্রপুর বা ইন্দোরের এক তৈলিক শ্রেণীর কথা আছে। বৈশালীতে 'শ্রেষ্ঠী-সার্থবাহ-কুলিক-নিগম', 'শ্রেষ্ঠী-কুলিক-নিগম', 'শ্রেষ্ঠী-নিগম' ও 'কুলিক-নিগম' নামাঙ্কিত প্রচুর সিলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। রঘুবংশে স্থপতি-সংঘের উল্লেখ আছে। বিশাখদত্তের মুদ্রারাক্ষসে মণিকার-সংঘের বর্ণনা আছে।

লক্ষ করবার বিষয়, বৈশালীর সিলমোহরে যেমন কুলিক অর্থাৎ কারিগর এবং শ্রেষ্ঠী অর্থাৎ মুখ্য বণিকদের স্বতন্ত্র সংগঠনের উল্লেখ আছে তেমনি শ্রেষ্ঠী ও কুলিকদের এবং শ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ ও কুলিকদের সম্মিলিত, বৃহত্তর সংগঠনেরও খবর আছে। সাধারণত এক একটি পেশাকে কেন্দ্র করে এক একটি সংগঠন গড়ে উঠত। কিন্তু বৈশালীর মতো বহুবৃত্তিক বৃহত্তর সংগঠনের পরিকল্পনা রাজ্যের অন্যান্য শহরে কতদূর কার্যকরী ছিল বলা শক্ত। দেখা যাচ্ছে, এ যুগের শিল্প ও বাণিজ্যিক সংগঠনগুলি তাদের নিজস্ব সিলমোহর ব্যবহার করত। পূর্ববর্তী যুগে এ ধরনের সিলমোহর বড় একটা পাওয়া যায় না। বৈশালীতে এ জাতীয় সিলমোহর বা সিলমোহরের ছাঁচ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। নিজেদের স্বতন্ত্র সিলমোহর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সংগঠনগুলির ক্রমবর্ধমান গুরুত্বই প্রকাশিত হয়েছে।

মন্দসোর লেখে বর্ণিত দশপুরের রেশমশিল্পী সংগঠনের কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। এই শিল্পীরা পূর্বে লাট অর্থাৎ দক্ষিণ গুজরাতে বাস করতেন কিন্তু পরে তাঁরা মালবের দশপুরে এসে বসবাস করেন। এখানে এসে শিল্পীদের কেউ কেউ তাঁদের পুরানো বৃত্তিতে থেকে গেলেও অন্যান্যরা তিরন্দাজি, জ্যোতিষ, কথকতা ইত্যাদি নতুন বৃত্তি গ্রহণ করেন। সংগঠনটির অনেক সদস্যের বৃত্তির পরিবর্তন ঘটলেও প্রতিষ্ঠানটির পুরানো পরিচয়ই অপরিবর্তিত থেকে যায়। সদস্যদের পেশার পরিবর্তন সংগঠনের পক্ষে শুভ সংকেত নয়। পেশাগত ঐক্য হল সংগঠনের মূল স্তম্ভ। তবে দশপুরের রেশম-শিল্পীদের তাঁদের আদি কর্মক্ষেত্র লাট অঞ্চল থেকে চলে আসা

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

এবং দশপুরে এসেও তাঁদের পেশার পরিবর্তন খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যভাগ নাগাদ পশ্চিম ভারতের রেশমশিল্পে এক গুরুতর সংকটের ইঙ্গিত বহন করছে।

সমকালীন লেখমালা থেকে পেশাদারি সংগঠনগুলির কর্মধারা সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। সংগঠনগুলি অনেক ক্ষেত্রে পূর্বের মতোই আধুনিক ব্যাংকের ভূমিকা পালন করত। ৪৬৫ খ্রিস্টাব্দের একটি লেখ থেকে জানা যায়, দেববিষ্ণু নামে এক ব্রাহ্মণ ইন্দোরের এক তৈলিক সংগঠনের নিকট কিছু অর্থ স্থায়িভাবে গচ্ছিত রেখেছিলেন। শর্ত ছিল, ওই আমানত করা অর্থের সুদ দিয়ে স্থানীয় সূর্যমন্দিরে প্রতিদিন দীপ জ্বালাবার জন্য দুই পলা করে তেল যোগান দিতে হবে। গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ যাতে হ্রাস না পায় সেদিকে সংগঠনের দৃষ্টি ছিল। অনুমান করা যায়, সদাশয় ব্যক্তিরা যে অর্থ সংগঠনে লগ্নি করতেন, সংগঠন তা নিজের ব্যবসায়ে খাটাত, হয়তোবা ক্ষেত্রবিশেষে কোনও ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে চড়া সুদে ধারও দিত[১]।

কখনও কখনও সংগঠনগুলি জনহিতকর কাজকর্মে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করত। উদাহরণ-স্বরূপ এখানে দশপুরের পট্টবায় সংঘের উল্লেখ করা যায়। সংঘ স্থানীয় এলাকায় একটি সূর্যমন্দির নির্মাণ করে এবং পরে মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে পড়লে তার সংস্কার সাধন করে।

সংঘে একজন করে সভাপতি ছিলেন। তাঁকে 'প্রমুখ' বা 'সংঘমুখ্য' বলা হত। ইন্দ্রপুরের তৈলিক সংঘের অধ্যক্ষ ছিলেন জীবন্ত। কারিগর-সংঘের সভাপতিকে সম্ভবত প্রথম কুলিক বলা হত। উত্তর বাংলায় কোটিবর্ষ জেলার প্রশাসনকার্যে কয়েকজন বেসরকারি ব্যক্তি জেলা-শাসককে সাহায্য করতেন। এঁদেরই একজন ছিলেন প্রথম কুলিক।

বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপ থেকেই সংগঠনের বেশি আয় হত। তাছাড়া সদস্যদের বিনিয়োগ করা মূলধন, চুক্তিভঙ্গকারী সদস্যদের দেয় জরিমানা এবং মহাজনি কারবার থেকেও সংঘের আয় হত। ক্ষেত্রবিশেষে হয়তো সরকারি সাহায্যও পাওয়া যেত।

ধর্মশাস্ত্র, বিশেষ করে নারদ ও বৃহস্পতির দু'খানি স্মৃতিগ্রন্থ পেশাদারি সংঘের গঠন, নিয়মাবলি, অধিকার ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত আলোকপাত করে। বৃহস্পতি বলেছেন, কোনও ব্যক্তিকে সংঘের সদস্যপদ পেতে হলে তাঁকে কয়েকটি প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হত। প্রথমে তাঁকে চারিত্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হত। দ্বিতীয়ত, সংঘের অনুশাসন তিনি মেনে চলবেন, এই মর্মে তাঁকে একটি অঙ্গীকারপত্র পেশ করতে হত। তৃতীয়ত, সংঘের এক পুরানো সদস্যকে নবাগতের জামিন হয়ে থাকতে হত। সংঘের সদস্যদের মধ্যে পারস্পরিক বিশ্বাস থাকা যে একান্ত আবশ্যক সে বিষয়ে নারদ ও বৃহস্পতি একমত।

প্রতিটি সংঘে সংগঠনের নিয়মাবলি ও সদস্যদের কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে এক স্থিতিপত্র বা চুক্তিপত্র ছিল। চুক্তিপত্রে বিধিবদ্ধ নিয়মাবলির আইনগত মর্যাদা ধর্মশাস্ত্রে স্বীকৃত হয়েছে। রাষ্ট্র সংঘের নিয়মকানুন মেনে চলবে এ বিষয়ে সকল ধর্মশাস্ত্রকারেরা সহমত। সকল সদস্যকেই সংঘের নিয়মাবলি মেনে চলতে হত। কোনও সদস্য বিধি-নিয়ম লঙ্ঘন করলে তাঁকে শাস্তি পেতে হত। ক্ষেত্রবিশেষে অপরাধীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হত ও তাঁকে নির্বাসনদণ্ড দেওয়া হত। তবে কোনও সদস্য অবিচারের শিকার হলে তিনি সুবিচারের আশায় রাষ্ট্রের দ্বারস্থ হতেন।

---

১. কেবল যে শিল্পী বা বণিকসংগঠনে অর্থ লগ্নি করা হত তা নয়, অনেক সময় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানেও চিরকালীন ভিত্তিতে অর্থ গচ্ছিত রাখা হত। ৪১৩ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁর পদস্থ রাজপুরুষ আম্রকার্দব সাঁচীর এক বৌদ্ধসংঘায় ২৫ দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) গচ্ছিত রেখেছিলেন। মহারাজাধিরাজ প্রথম কুমারগুপ্ত একইভাবে এলাহাবাদ অঞ্চলের এক ব্রাহ্মণ্য প্রতিষ্ঠানে ১২ দীনার লগ্নি করেছিলেন।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

সংঘমুখ্যকে সাহায্য করার জন্য দুই, তিন বা পাঁচজন বিশেষ সদস্যকে নিয়ে একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করা হত। কার্যকরী সমিতির সদস্যদের কার্য-চিন্তক বলা হত। সদস্যদের মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে সংঘমুখ্য স্বয়ং বা কার্য-চিন্তকদের সহযোগিতায় সে বিরোধের নিষ্পত্তি করতেন। কখনও কখনও সংঘমুখ্যের সঙ্গে কার্য-চিন্তকদের বিরোধ বাধত, কখনওবা কার্য-চিন্তকদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাবে সংঘে অচলাবস্থা দেখা দিত। সংঘমুখ্যও হয়তো সংঘের স্বার্থবিরোধী কোনও কাজে জড়িত হয়ে পড়তেন। সেসব ক্ষেত্রে রাজা সংঘের কাজে হস্তক্ষেপ করতেন। সংঘ রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত হলে, সংঘ তার ক্ষমতার অপব্যবহার করলে বা একাধিক সংঘের মধ্যে বাদ-বিসংবাদ দেখা দিলে রাজা হস্তক্ষেপ করবেন, নারদ ও বৃহস্পতি এ বিধান দিয়েছেন।

সংঘ কোনও কার্যভার গ্রহণ করলে তা যেন সমবায় প্রথায় সম্পন্ন হয় সে বিষয়ে নারদ এবং বৃহস্পতি স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতি স্পষ্ট বলেছেন যদি কোনও সদস্য সংঘের বিনা অনুমোদনে কোনও কাজে প্রবৃত্ত হন এবং সেই কাজে যদি সংঘের এজমালি সম্পত্তির ক্ষতি হয় তাহলে বিপথগামী সদস্য ক্ষতিপূরণের যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। বৃহস্পতির এই বিধানে সংঘের সামূহিক চরিত্র প্রকাশ পেয়েছে।

সদস্যরা সমপরিমাণ মূলধন বিনিয়োগ করবেন এই ছিল সাধারণ রীতি। কিন্তু সকলের সংগতি সমান না হওয়ায় বাস্তবক্ষেত্রে প্রায়শই এর ব্যতিক্রম ঘটত। প্রায়ই দেখা যেত কোনও সদস্য বেশি বা কম মূলধন গচ্ছিত রাখছেন। সেক্ষেত্রে নারদ ও বৃহস্পতি নির্দেশ দিয়েছেন, সংঘের লাভ বা ক্ষতির ক্ষেত্রে সদস্যের লভ্যাংশ বা দায় তাঁর মূলধনের আনুপাতিক হারে ধার্য হবে। একটু খেয়াল করলেই বোঝা যাবে, বেশির ভাগ শাস্ত্রীয় বিধানের পিছনে যুক্তি আছে, সমদর্শিতা ও সূক্ষ্ম বাস্তববোধের পরিচয় আছে।

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner